কালধ্বনি

একাদশ বর্ষ, প্রথম - দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ২০০১

- উন্নয়ন পরিক্রমা ঃ নর্মদা উপত্যাকা প্রকল্প

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা
আমদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।।

পাথরে পাথরে গড়িয়ে আসছে মান। মান মিশবে নর্মদায়। তার আগে এই নদী, এইখানে, এই খেড়ি-বলওয়ারি গাঁয়ে তেমন খরস্রোতা নয়। নদীর জলে পা ডুবিয়ে মৃদুস্বরে বলে চলি, আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি...। আমাদের সঙ্গে কেরালা থেকে আসা, বাম গণতান্ত্রিক জোটের অন্যতম নেতা জনতা দলের সাম চাক্কার, নাসিকের শেখ রাজ্জাক, গাঁয়ের বেশ কয়েকজন যুবক কিশোর। সাম এসেছেন কেরালা থেকে ২০ জনের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে, মান নদীতে নির্মীয়মান বাঁধের বিদ্ধে সত্যাগ্রহে যোগ দিতে। রাজ্জাক গত তিনবছর ধরেই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচীই ভিডিও ক্যামেরায় ধরে রাখছেন। প্যানাসোনিক এক৩০০০। ব্রত পালনের তাগিদেই রাজ্জাকও এই নদীকূলে। এখানে আসার আগে সত্যগ্রহের অন্যান্য এলাকাও ঘুরে এসেছেন, জলসিদ্ধি ডোমখেড়ি অঞ্চলে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন পরিচালিত শিশুদের স্কুলের গল্প শোনাচ্ছিল সাম চাক্কার - কে।
গতকাল, বুধবার (১১।০৭।০১) আমি, নিতাই (ঘোষ) আর প্রবীর (মিত্র) ইন্দোর হয়ে পৌঁছেছিলাম বরওয়ানি - তে সত্যাগ্রহ শু হয়েছে ৯ তারিখ থেকে গত অক্টোবরে সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের অনুকূলে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে। বাঁধের উচচতা ৮৫মিটার থেকে বাড়িয়ে ৯০ মিটার করা যাবে। এ ছাড়া আছে ৩ মিটার হাম্প। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল উচচতা৮৬ মিটার হওয়াতেই যারা ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছে, তাদের পুনর্বাসন এখনও হয়নি, সুতরাং স্থগিত থাক নির্মাণ কাজ। জানিয়েছিল, প্রকল্পটি আবার নতুন করে বিচার হওয়া উচিত কেননা এই প্রকল্প গোড়া থেকেই ত্রুটিপূর্ণ।
তিনজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে জানিয়েছে প্রকল্পে ১৩৬.৬৮ মিটার (৪৫৫ফুট) উচচতা অবধি নির্মাণকাজ অব্যাহত থাকবে। প্রতি ৫ মিটার কাজ এগিয়ে যাওয়ার পরে পরিবেশ ও পুনর্বাসন দপ্তরের অনুমোদন নিতে হবে। যেহেতু ৯০ মিটার উচচতার পরিবেশগত ছাড়পত্র রয়েছে সুতরাং এই অবধি নির্মাণকাজ এখনই শু করা যাবে। বিচারপতিআনন্দ ও বিচারপতি কৃপাল এই রায় দেন, অন্যদিকে বিচারপতি ভাচা ভিন্নমত পোষণ করেন। ৮৫ (৩) মিটার থেকে ৯০ (৩) মিটার বাঁধের উচচতায় জমি - বসত থেকে উৎখাত হবেন এই বছরই আরও ৩০০০ পরিবার। প্রতিবাদে বরওয়ানি-তে অনশন শু করেছেন মান বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত চন্দর সিং, মাহ্মের বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত সুশীল বাঈ, সর্দার সরোবরে ক্ষতিগ্রস্ত বুদিভাই পাটোয়ার, মঙ্গিলাল ভাই, প্রবীণ সমাজবাদী নেতা প্রাত্তন সাংসদ সুরেন্দ্রমোহন, গুজরাটের গান্ধিবাদী নেতা সিদ্ধরাজ ডাড্ডা, বেনারসের প্রবীন গান্ধিবাদী নেতা অমরনাথ ভাই, প্রবীন শিক্ষা

বিদ জ্যোতিভাই দেশাই, মহারাষ্ট্রে সমাজসেবী পুষ্পা ভাবে, মহিলা সাংবাদিক বিদ্যা বলা সহ অনেক বিশিষ্ট মানুষজন। ৯ তারিখে সত্যাগ্রহ সূচনা করেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ প্রবীন সমাজবাদী গান্ধিবাদী বর্ষীয়ান নেতা বাবা আমতে। নর্মদাকূলে তার বাসস্থান 'নিজবল' -এ সেদিন তুমুল বৃষ্টির মধ্যেই জনসভায় হাজির ছিলেন বহুসংখ্যক মানুষজন, এমনকি বেদা গৈ, এবং মাঝের বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনও ছিলেন। ছোট - কাসারিবাগের সভায় ৮৭ বছরের এই বর্ষীয়ান নেতা, রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ননকে অনুরোধ করেন পরিস্থিতি তিনি যেন নিজেই দেখে যান। ওই দিন থেকে তিনি নিজেও শু করেছেন অনির্দিষ্টকালের জন্য সত্যাগ্রহ।

৯ তারিখের সভায় বিবরণ - কথা আমরা শুনেছিলাম অবশ্য সঞ্জয় সাংভি-র মুখে। সঞ্জয়, এই আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয়কর্মী সঞ্জয়ই বলছিল, ওই সভায় বাবা আমতে বলেছেন, এবছরই ভরা বর্ষায় অনেক গ্রামেই সর্বনাশ নেমে আসতে পারে। এসবই হচ্ছে বাঁধনির্মাণের সংগে যুক্ত স্বার্থান্বেষী কিছু লোকের তৎপরতা এবং বিকৃত অসুস্থ উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলশ্রুতি। গ্রামবাসীদেরই এই ডুবে যাওয়া রোধ করতে হবে। সাহসের সঙ্গে অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে। সভায় মেধা পটকর বলেছেন, আমরা আমাদের ন্যূনতম অধিকারটুকুও ডুবে যেতে দিতে পারি না।

মেধার সঙ্গে দেখা হল না এবার। আমাদের ধারণা ছিল না, ইন্দোর শহর থেকে বরওয়ানি পৌছুঁতে আমাদের অত সময় লেগে যাবে। কোথাও যেন শুনেছিলাম বা নিজেরাই ভেবে নিয়েছিলাম ১৫০-১৬০ কিমি পথ একস্প্রেস বাসে ঘন্টা তিন সাড়ে তিনেই পৌঁছে যাবে। কিন্তু বাস বদল করে টিকরি হয়ে বরওয়ানি আসতে সময় লেগে গেল ছ'ঘন্টার ওপর। পাহাড় থেকে পাহাড় পেরিয়ে যাত্রাপথ। দেড়টা নাগাদ বরওয়ানি জেলা কালেকটরেট অফিসের সামনে, সত্যাগ্রহ - মঞ্চে যখন হাজির হলাম, মেধাজী তখন ডোমখেড়ির পথে। সেখানেও সত্যগ্রহ চলছে ৫ তারিখ থেকে।

বরওয়ানি থেকে ৬ - ৭ কিলোমিটার দূরে ছোট - কাসরাবাদ। ওখানেও নর্মদার কোল ঘেঁসে সত্যাগ্রহ মঞ্চ আর এখানেই বাবা আমতের কুটির। কুটিরই। নিজবল। অ্যাসবেসটসের ছাউনি। ছোট ছোট দুটো ঘর। সামনে বারান্দা। বড় সড় একটা উঠোন। সারা বাড়ি ঘিরে গাছ। অনেক গাছ। বৃক্ষ। ফুলগাছ। নানান গাছ। উঠোন শেষ হয়ে পায়ে চলা পথ নেমে গেছে নর্মদায়। এখন এই জুলাইয়ের প্রায় মধ্যভাগে (১১ তারিখ) নর্মদা বয়ে যাচ্ছে অনেক নীচ দিয়ে। ১৯৯৪ সালে যখন বাঁধের উচচতা ছিল ৬৯ মিটার তখনই এক ভরা বর্ষায় নর্মদা উঠে এসেছিল এই উঠোনে। এখন বাঁধের উচচতা ৯০ মিটার। ৫ মিটার করে করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে উচচতা হবে ১৩৮.৬৮ মিটার (৪৫৫ ফুট)। জলাধারের সর্বোচচ জলতল হবে ১৪০.২১ মিটার (৪৬০ ফুট)। সর্বনিম্ন ১১০.৬৪ মিটার (৩৬৩ ফুট)। ০.৯৫ মিলিয়ন হেক্টর মিটার (৭.৭ মিলিয়ন একর ফুট) জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জলাধার ডুবিয়ে দেবে ১১৩১৮ হেক্টর চাষের জমি, ১৩৭৭৪ হেক্টর বনভূমি, ১৪০৭২ হেক্টর নদী অববাহিকা অঞ্চল ও পতিত জমি ডুবে যাবে সর্বমোট ৩৯১৩৪ হেক্টর জমি। মোট ২৪৫টি গ্রামের জমি। ৩টি গ্রাম সম্পূর্ণ ডুবে যাবে, অংশত ডুববে ২৪২ টি গ্রাম। মধ্যপ্রদেশের ১৯৩, মহারাষ্ট্রের ৩৩ আর গুজরাটের ১৯টি গ্রাম। ভাবতে বাধ্য হচ্ছিলাম, আজ, ১১ই জুলাই ২০০১ সালে, যে গ্রামের, যে কুটির - বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, অপেক্ষা করছি আমি, নিতাই, প্রবীর, বাবা আমতের সঙ্গে দেখা করব বলে, আগামী কোন এক বছরে এই উঠোন, বারান্দা, টিনের দেওয়াল, অ্যাসবেস্টস ছাউনি, সযত্ন পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা গাছগাছলি, সবই হয়ে যাবে এক সুবিশাল জলাধারের অংশবিশেষ।

সরকারি ভাষ্যেই বলা হয়েছে, সর্দার সরোবর বাঁধ - প্রকল্প পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করবে যখন নর্মদার উজানে বাঁধ প্রকল্প সফলভাবে রূপায়িত হবে। বিশেষভাবে নর্মদা সাগর (ইন্দিরা সাগর) প্রকল্প। সেই প্রকল্পে জলের তলায় তলিয়ে যাবে ৯১,৩৪৮ হেক্টর মোট জমি, যার মধ্যে কৃষিযোগ্য জমি থাকবে ৪৪,৩৬৩ হেক্টর, বনভূমি ৪০,৩৩২ হেক্টর। সম্পূর্ণ জলমগ্ন হবে ৮৯ টি গ্রাম, আংশিক ৬০ টি। এলাকার ২৫৪ টি মোট গ্রামের মধ্যেঅক্ষত থাকবে মাত্র ১০৫টি গ্রাম। প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কমবেশি ২,৯৪,৭০৯ জন মানুষ, নর্মদা সাগরে ১,৯৪,৪৯২ জন আর সর্দার সরোবরে ১,০০,২১৭ জন মানুষ। হিসাব এই বছরেরই অর্থাৎ ২০০১ সালে। এর পরও উদ্বাস্তু হবেন আর্য অনেক মানুষ। প্রায় ১,৪০,০০০ জন। এদের জমি যাবে বাঁধ থেকে সে সব প্রধান অপ্রধান ক্যানাল কাটা হবে। এই নতুন সংরক্ষিত বনাঞ্চল যেখানে গড়ে উঠবে সেখান থেকে বিতাড়িত হবেন হাজার হাজার আদি জনগোষ্ঠিভুক্ত মানুষ। প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের সংখ্যা হিসাবে এদের ধরা হয়নি কেননা আদি জনগোষ্ঠির বনাঞ্চলের জমির ওপর কোন ধরা হয়নি কেননা আদি জনগোষ্ঠির বনাঞ্চলের

জমির ওপর কোন আইন মোতাবেক দখলিস্বত্ত্ব নেই।

১৮ অক্টোবর ২০০০ সালের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে ৫ মিটার করে করে বাঁধের উচচতা বাড়ানো হবে আর নর্মদা কন্ট্রোল অথরিটি দেখবে নর্মদা ট্রাইবুনালের সুপারিশ মান্যতা পাচ্ছে কিনা। পুনর্বাসন দপ্তর ও পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র পেলেই তার পরের ৫ মিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরও, তখন অবধি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের পুনর্বাসনের কাজ সুসম্পন্ন হল না কেন? পুর্নবাসন সম্ভব নয় প্রায় এই মর্মেই মধ্যপ্রদেশ সরকারের দাখিল করা এফিডেফিট সত্ত্বেও ৯০ মিটার নির্মাণকার্যের অনুমতি দেওয়া হল কেন?

পুনর্বাসন সত্যিই কি সম্ভব? ৩ লাখেরও বেশি মানুষজনের প্রকৃত পুনর্বাসন! একটা গোটা অঞ্চলে, একটা গোটা গ্রামের, এক টা গোটা সম্প্রদায়ের পরিবার পরিজন - আত্মীয় - স্বজন গৃহপালিত - পশুপাখি আচার - বিচার -সংস্কৃতি - সখ্যতা নিয়ে প্রকৃত অর্থে পুনর্বাসন হয় না। সত্যতা থাকে তুলসিতলার সঙ্গে, আত্মীয়তা আকাশ প্রদীপে। নিকানো উঠোন, বাহির দেওয়ালের অংকন - চিত্র, নদীর হাঁটা পথ, পাখপাখালির ডাক, বাছুর ছুটের পুনর্বাসন হয়না খরস্রোতা নদীকে শীর্ণ করে, বদ্ধজলায় আবহমান কালের সংস্কৃতি কৃষ্টির পুনর্বাসন হয় না। সেসব যদি ছেড়েও দেওয়া হয়, কথা হয় প্রয়োজন নেই জনগোষ্ঠির কোন অতীতে, আজ থেকে ই নতুন করে সব কিছুর শু, তা হলেও কোথায় মিলবে লাখ তিনেক মানুষের চাষযে াগ্য জমি? বসত নির্মাণের জমি?

নর্মদার উজানে, জববলপুরের কাছে ৯০-৯১ সাল নাগাদ সম্পূর্ণ হয়েছে আর একটি বাঁধ, বার্গি বাঁধ। বাঁধ তৈরির অ াগে মধ্যপ্রদেশ সরকার হিসাব কষে দেখিয়েছিল, জলমগ্ন হবে ১০১ টি গ্রাম, গৃহচ্যুত হবে ৭০,০০০ জন মানুষ। বাস্তবে জলমগ্ন হয়েছে ১৬২টি গ্রাম, গৃহচ্যুত ১,১৪,০০০। পুনর্বাসন? বিজ্ঞাপনে 'আদর্শ গ্রাম'য়ের কথা ছিল। আজ সে সব গ্র ামের বেশিরভাগই পরিত্যক্ত, মানুষজন আশ্রয় নিয়েছেন জঙ্গলের গভীরে, হ্যাঁ অবৈধভাবেই। ভীড় করেছেন জববলপুর অ ার কাছাকাছি সব শহরের বস্তিতে বস্তিতে, রাস্তার ধারে, খালের পাশে, নালার পাশে। ক্ষতিপূরণ কেউ পাননি, তা নয়। পেয়েছেন। কেমনভাবে পেয়েছেন, কত সময় লেগেছে যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ পেতে, অনুমান করে নিন। কংক্রিট জঙ্গলের ফঁ াক ফোকর গলে, সেন্ট্রির হাজারটা প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিয়ে, ট্যানা - কানি জড়ানো শহরের সহবৎ না জানা এক মানুষ সরকা রি অফিসারের কাছে ক্ষতিপূরণের দরবার করেছে!

এদেরই বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা খেড়ি - বলওয়ারি গ্রামের সত্যাগ্রহস্থলে। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে আবেদন নিবেদনে ক্ল ান্ত বিরত্ত এই সব মানুষজন আবার মিছিল মিটিং সত্যাগ্রহ - আন্দোলনে।

।।দুই ।।

পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি এবং নবম ফিনান্স কমিশন বড় বাঁধ সম্পর্কে মন্তব্য করেছে,'a burden on Indian Economy' । ১৯৮৭ সালে, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি, মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে বলেছিলেন, During the last 16 years we have invested funds in such projects but there has not been expected irrigation water or increase in production…the quality of life of common people have remained the same'. যখন একদিকে এই সব কথা বলা হচ্ছে তখনই সেই ১৯৮৭ সালেই বন সংরক্ষণ আইন (১৯৮০) মোতাবেক কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ দপ্তর, সর্দার সরোবর প্রকল্প ও নর্মদা সাগর প্রকল্প সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীকে একটি রিপোর্ট পেশ করে। বিশদ সেই রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়, নর্মদা সাগর প্রকল্প পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমোদনযোগ্য নয়। বলা হয় বিচ্ছিন্নভাবে সর্দার সরোবর প্রকল্প বিবেচনা করা উচিত নয়। পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে (সেপ্টেম্বর মাসে) তিন শতাধিক বিশিষ্ট ভারতীয় পরিবেশবিদ, প্রযুক্তিবিদ, সমাজবিদ, বুদ্ধিজীবী প্রচুর তথ্য ও যুক্তি দিয়ে নর্মদা উপত্যকা প্রকল্প (নর্মদা ও তার ৪১৯ টি শাখা নদীতে মোট ৩২০০ বাঁধ দেওয়া হবে।এর মধ্যে ৩০টি 'মেজর', ১৩৫টি 'মিডিয়াম' এবং বা কি সব 'স্মল'। ৩০টি 'মেজর' বাঁধের মধ্যে দুটি, নর্মদা সাগর ও সর্দার সরোবর 'মেগা' বাঁধ। প্রকল্প খরচ সেই প্রথম অ ামলেই ধরা হয়েছিল, দুটি 'মেগা' বাঁধের জন্য ১,৪০,০০০ কোটি টাকা এবং গোটা প্রকল্পের জন্য ২,৫০,০০০ কোটি ট াকা, রূপায়ন - সময় ১১০ মাস) পর্যালোচনার দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপির মুখবন্ধ হিসাবে বাবা আমতে প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠিও দেন। এসবের প্রত্যুত্তরে রাজীব গান্ধি সরকার ১৯৮৮ সালেই সর্দার সরোবর

প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য ১৯২৩সালের অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের আওতায় নিয়ে আসে।
স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে আমাদের এই দেশে ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছে প্রায় ৬ কোটি মানুষ। আনুমানিক হিসাব, সরকারি তথ্য পরিসংখ্যান নির্দিষ্টভাবে কোথাও নেই। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প াবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একবার একটা তথ্যে জানায়, ভারতের বাঁধ নির্মাণের জন্য উদ্বাস্তু হয়েছে ৩.৩ কোটি মানুষ। র াল ডেভেলপমেন্টের সেক্রেটারি হিসাবে সংখ্যাটা হবে ৪.০ কোটি আর ওয়াল্ড কমিশন অন ড্যাম রিপোর্টে বলা হয়েছে। আর ওয়ার্ল্ড কমিশন অন ড্যাম রিপোর্টে বলা হয়েছে ৫.৬ কোটি মানুষ। ১০০ কোটির দেশে ৫.৬ কোটি মানুষ।
সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের হিসাবে ভারতে বড় বাঁধের সংখ্যা ৩৬০০। তার মধ্যে ১৯৪৭ সালের পর তৈরি হয়েছে ৩৩০০টি। ১০০০টির মত বড় বাঁধের নির্মাণ কাজ চলছে।
ভারতে বড় বাঁধের ৯০ শতাংশই সেচ বাঁধ। অর্থাৎ সেচযোগ্য জমি পরিমাণ বেড়েছে। বস্তুত স্বাধীনতার ৫০ বছরে সেচযে াগ্য জমির পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ১৪০ ভাগ। খাদ্যশস্য উৎপাদনও বেড়েছে। আমরা খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর ছিলাম না। ১৯৫১ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৫.১ কোটি টন। ২০০০ সালে উৎপাদন কম বেশি ২০.০ কোটি টন। অর্থাৎ ৫০ বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ৪ গুণ।
খাদ্যশস্যের উৎপাদন যে বাড়ল, তার কত অংশ বাঁধ নির্মাণ - জনিত সেচ ব্যবস্থার উন্নতিতে? সরকারি কোন তথ্য নেই। ওয়ার্ল্ড কমিশন অন ড্যাম রিপোর্টের ভারত বিষয়ক অধ্যায়ে বলা হয়েছে উৎপাদন বেড়েছে শতকরা১০ ভাগেরও কম। ২০.০ কোটি টনখাদ্যশস্যের ১০ ভাগ। ২.০ কোটি টন। (ওয়ার্ল্ড কমিশন অন ড্যাম রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ১৬ নভেম্ বর, ২০০০। লন্ডনে। প্রকাশ করেছেন নেলসন ম্যান্ডেলা। ভারত বিষয়ক অধ্যায়ের তথ্যবিন্যাসে ছিলেন, সেন্ট্রাল ওয়াটার রিসোর্স - এর প্রাক্তন ডিরেক্টর, সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের প্রাক্তন সেক্রেটারি এবংইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যা ডমিনিস্ট্রেশনের দুজন অধ্যপক।) মিনিস্ট্রি অব ফুড অ্যান্ডসিভিল সাপ্লাইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, মোট খাদ্যশস্য উৎপ াদনের শতকরা ১০ ভাগ এ দেশে নষ্ট হয় গুদাম ঘরের অব্যবস্থায়, ইদুঁর পোকামাকড়ের দৌরাত্ম্যে। যে ২ কোটি টন ব াড়তি খাদ্য উৎপাদিত হল ৩৫০০-৩৬০০ বড় সেচ বাঁধ দিয়ে, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে, ৫ কোটি লোকেরও বেশি মানুষজনকে উদ্বাস্তু করে, সেই উৎপাদন পুষিয়ে যেত যদি শুধুমাত্র খাদ্যশস্য গুদামজাত করার, ঠিকমতো মজুত কর ার উপায় - পদ্ধতি উন্নত করা যেত! শুধু তাই নয় এইসব বাঁধ নির্মাণে ৫০ লক্ষ হেক্টর বনভূমি, চাষের জমি ও অন্যান্য পতিত জমি জলের তলায় চলে গেছে এবং আরও ১ কোটি হেক্টর জমি আজ কর্দমাক্ত, লবানাক্ত; যার মধ্যে ৫০ লক্ষ হেক্টর জমির উৎপাদনশীলতা শূন্যে নেমে গেছে।
এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। ফুড করপোরেশন অব ইন্ডিয়ার গুদামে ২০০১ সালের মার্চ মাসে ঠিক মতো বন্টন না হওয়ার ৬.০ কোটি টন খাদ্য শস্য মজুদ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্তমানে ভারতে বাফার হিসাবে মজুত থাকার কথা ২.০ কোটি টন। একদিকে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ৪.০ কোটি টন আর অন্যদিকে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ৩৬ কোটি ভারতব াসী (পরিবার পিছু মাসিক আয় ১৫০০ টাকার নীচে)-র ৫ কোটি প্রায় অনাহারের মুখোমুখি। ২০০০ সালে ১০ লাখ টন খাদ্যশস্য এফ সি আই - কে নষ্ট বলে ঘোষণা করতে হয়েছে।

।। তিন ।।
গত বছর অক্টোবরের ৩১ তারিখে সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পের একটি নির্মাণস্থল উদ্বোধন করতে গিয়ে মাননীয় স্বর াষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানিজী বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন - ডি - এ সরকারের তিনটি মহান অবদানের কথা আম াদের জানিয়েছেন। ১৯৯৮ সালে পোখরানে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক সফল বিস্ফোরণ, ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধ বিজয় এবং ২০০০ সালে সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পের অনুকূলে সুপ্রিম কোর্টের রায়।
১১ই ও ১৩ই মে ১৯৯৮ সালে ভারত সরকার পোখরান রেঞ্জে দুদিনে ৫টি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এর মধ্যে একটি ছিল হাইড্রোজেন বোমা। ভারত সরকার বিবৃতি দেয়, সফল পরীক্ষা। ১১ তারিখের তিনটি বোমার মিলিত বিস্ফোরণ ক্ষমতা ছিল ১০০ কিলোটন (১৯৪৫ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাপান যে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে ত ার ক্ষমতা ছিল ১২ কিলোটন)।১৩ তারিখের বোমা দুটির বিস্ফো রণ ক্ষমতা কম হলেও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আরও

উন্নত বলে ভারত সরকারের দাবি।
বিস্ফোরণের ১৭ দিন ব্যবধানে ২৮ শে মে পাকিস্তান সরকারও ছ'টি বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েদেখিয়ে দিল ত ারাও পিছিয়ে নেই। বোমাতেও নয়, ক্ষেপনাস্ত্রেও নয়। ভারতের পৃথ্বী, পাকিস্তানের ঘাউড়ি। ভারতের অগ্নি, পাকিস্তানের গজনী। পাকিস্তানের বিদেশি ঋণের বোঝা ৩৬,০০০ কোটি ডলার, ভারতের ৯১,০০০ কোটিডলার (১৯৯৮ সালের পরিসংখ্যান)।
বোমা ও ক্ষেপনাস্ত্র বানানোর যুক্তি ভারতের আছে। পাকিস্তানেরও আছে। বোমা বানানোর কোন না কোন কারণ আছে ইরাক ইরান সৌদি আরব কুয়েত ইস্রায়েল সুদান আফগানিস্তান বসনিয়া নরওয়ে ডেনমার্ক জার্মাণ কানাডা জাপান বার্মা শ্রীলঙ্কা ভিয়েতনাম মালয়েশিয়া নেপাল সববাইয়ের।
বোমা যখন আছে যুদ্ধে ব্যবহারের সম্ভাবনাও আছে। পরিকল্পনা -- মাফিক আত্রমণে ব্যবহার করা না হলেও, অন্যজন বে ামা ফেলতে পারে এমন কোন তীব্র আতঙ্কবোধ অথবা অন্যজন বোমা ফেলতে যাচ্ছে এমন কোন ভুল বিপদসংকেতই যথেষ্ট একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সূচনা করতে।
গ্রাম শহর জ্বলছে
জ্বলছে ক্ষেত খামার অরণ্য
নদী নালা পুকুর বিল বাতাস আগুন
জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে যা কিছু দাহ্য
ধোঁয়া ছাই বাষ্পে ঢেকে গিয়েছে সূর্য
রাত আসে হিমাঙ্ক তাপমাত্রায়। তেজস্ক্রিয় ভস্ম ছেয়ে দেয় বরফ
ঘরবাড়ি। মাটির নীচের জলও তেজস্ক্রিয়। মারা গেছে
বেশিরভাগ মানুষ পশু - পক্ষী - মাছ, গাছপালা। ইঁদুর আর
আরশোলা মৃত মানুষের ঘ্রাণ নেয়, চাটে, খুবলে খায়
যারা বেঁচে গেছে তাদের অধিকাংশই দগ্ধ। অন্ধ। কানা। খোঁড়া।
অসুস্থ। জীবনীশক্তি হীন। নতুন যেসব শিশু জন্ম নেবে তারা
বিকলাঙ্গ।

আদবানিজী গর্বিত এমন এক বোমার জন্ম দিতে পেরে। আদবানিজী জানেন ১০০ কোটি মানুষের এই দেশে ৪০ কোটি ম ানুষ নিরক্ষর। আদবানিজী জানেন কী ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে তাদের টিঁকে থাকা। আদবানিজী জানেন, এই দেশের ৬০ কোটি লোকেরই প্রাথমিক স্যানিটেশনের অভাব, ২০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত। উন্নয়ন - মাত্রার নিরিখে পৃথিবীর ১৭৫টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩৮ নম্বরে।
মাননীয় শ্রী আদবানিজী কার্গিল যুদ্ধজয়ের উল্লেখ করেছেন। কি যুদ্ধ, কেমন যুদ্ধ কোথায় যুদ্ধ? সিয়াচেন গ্লেসিয়ার নিয়ে ক ারাকোরামের বরফাচ্ছন্ন গিরিশৃঙ্গে, ১০-১৫ হাজার ফুট উচচতায়, (-) ৪০ থেকে (-) ৫০ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড তাপমাত্রায় ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ। যে যুদ্ধ চালাতে ভারতের খরচ হয় প্রতিদিন প্রায় ৯০ কোটি টাকা। বছর ঘুরে ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। যে যুদ্ধে কেউ হারে না, কেউ-ই জেতে না, দু-দেশই রক্তাক্ত হয়। এবং এই যুদ্ধ চলছে সেই ১৯৮৩ সাল থেকে। মাঝে মাঝে যুদ্ধবিরতি। ১৯৯২ সালে একবার যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। সেইরকমই আবার একবার।
টাকার অপব্যবহারের জন্যই এই যুদ্ধ অবাঞ্ছিত তাই নয়, এই যুদ্ধ অমানবিক। যে সেনানীরা যুদ্ধ করে তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়। কারাকোরামের ওই উচচতায় সবসময়ই ঝোড়ো হাওয়া। তাঁবুর ভেতর উত্তাপের জন্য কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালিয়ে রাখতে হয় ২৪ ঘন্টাই। ৩ মাস পরে একজন সেনা মূল ত াবুতে ফেরে, ফেরে কালিঝুলি মেখে, কার্বন - মনোক্সাইড কার্বন - ডাই- অক্সাইডশ্বাসের সঙ্গে নিয়ে নিয়ে নির্জীব, ক্লান্ত। বেশিরভাগেরই কথায় সঙ্গতি নেই। টানা তিন মাস তাদের প্রতীক্ষা করতে হয়েছে হেলিকপ্টারের। খাদ্য আসবে কপ্টারে। পানীয় কপ্টারে। কেরোসিন কপ্টারে। ঝোড়ো আবহাওয়ারজন্য কপ্টার সমসময় আসতে পারে না; এলেও খাদ্যসামগ্রী

ফেলতে না পেরে ফিরে যায়। চেতক কপ্টারে পাইলট দুজন। সুতরাং বাড়তি ওজন নিতে পারে আর মাত্র ২৫ কেজি। ২৫ লিটার কেরোসিন সহ একটি হেরিকেন! প্রতি বছরই অন্তর ১০০০ জন সেনা আহতহয়, অসুস্থ হয়, যুদ্ধের জন্য নয়, প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে। খাবার কপ্টারে এলেও মূল ছাউনি থেকে অগ্রভাগের তাঁবুতে পৌঁছানো কিন্তু পায়ে হেঁটে। ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ বরফে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। ১৯৫৩ সাল থেকেই যুদ্ধ চলছে এক কাল্পনিক রেখা বরাবর। এরই মধ্যে কংগ্রেস, জনতা, বিজেপি সরকার এসেছে, চলে গেছে কেউই সাময়িক যুদ্ধবিরতি ছাড়া স্থায়ী কিছু করেনি।

এখন অবশ্য কেউ যুদ্ধ করেনা। যদি কোন রাষ্ট্র যুদ্ধ করে তবে সে এমনভাবে প্রচার করে যেন নিজের দেশ রক্ষা করার জন্যই এই যুদ্ধ। দেশ রক্ষার জন্যই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কেমন করে চাওয়া হবে খরচের হিসাব? পারমাণবিক অস্ত্র বা ক্ষেপনাস্ত্র একেই নাকিমাঘার প্রশ্ন, দেশের মর্যাদার প্রশ্ন, তার ওপর আইন নিষিদ্ধ এই অস্ত্র তৈরির হিসাব নেওয়ার। প্রাকৃতিক, দুর্যোগ, খরা বন্যা ভূকিম্পে ক্ষতিগ্রস্ত আমারই দেশের মানুষ। তাদের জন্য খরচের হিসাব চাওয়ায় নিজেকেই ছোট মনে হয়। আর রাষ্ট্রনায়কেরা একেই পুঁজি করে হিসাব বহির্ভূত আর্থিক সংস্থান করে নিজের, নিজের দলের।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিজেদের চাহিদা মতো আনা যায় না। যুদ্ধ করা যায়। যুদ্ধের জন্য তহবিল গড়া যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিজেকে দাতা হিসাবে প্রতিপন্ন করা যায়। খুশি মত অর্থ নিজের কাছে রাখা যায়। কতটা, সে পরিমাণ অবশ্য কোষাগার নির্ভর। আসল কথা হিসাব দেওয়ার দায় নেই। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিরও কোন জবাবদিহি করতে হয় না। আসলে সাধারণ মানুষের যতই দুর্ভোগ হোক না কেন শাসক দলের বৈতরণী পারের কড়ি মেলে কিন্তু এইসব যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুযোগ বা কোন অঘটন - ঘটনা থেকে।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান নেপাল থেকে ছিনতাই হয়ে উঠে গেল কান্দাহারে। অপহৃত যাত্রীদের ছাড়াতে মুক্তিপন দিতে হয়েছিল। কলকাতায় পার্থপ্রতিম রায়বর্মনকে ছাড়াতে মুক্তিপন দিতে হয়েছে, শোনা যায় ৪-৫ কোটি টাকা। কান্দাহারে অমন একটা অপহরণে কত টাকা মুক্তিপন দিতে হয়েছে। রায়বর্মনেরা না হয় তাদের নিজস্ব পারিবারিক সম্পত্তি থেকে মুক্তিপন দিয়েছে। কিন্তু বিমান ছিনতাইয়ের যে ৫০০-১০০০-২০০০ কোটি টাকা মুক্তিপন দিতে হল, সে টাকা দেওয়া হল কোথা থেকে? বাৎসরিক বাজেটে এই খরচ দেখানো হয়নি। বাজপেয়ি আদবানি যশোবন্ত সিংয়ের নিজস্ব ব্যক্তিগত তহবিল থেকে নিশ্চয়ই ওই অর্থ দেওয়া হয়নি। তবে কোথা থেকে এল? কোষাগারে ওই টাকা খরচ করার হকদার কে? কেইবা বলতে পারে ১০০০ কোটি টাকা মুক্তিপন বলে ৫০০ কোটি মুক্তিপন দিয়ে বাকি টাকা তার বা তার দলের হাতে চলে যায় না? রাজ-কোষাগারে টাকা আসে কোথা থেকে?

১৯৯৮ সালে এন-ডি-এ সরকারের তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ সাংবাদিক অমিতাভ ঘোষকে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমার মনে হয় এই দেশের উচচাসনে বসে থাকা লোকগুলোর দেশ সম্পর্কে কোন মমত্বই নেই। যদিথাকত, তবে এমনভাবে কোষাগার লুঠ করত না। বিশ্বের সব বদমাশগুলোর জন্য দেশের তাবৎ দরজা খুলে দিয়ে গোটা দেশটাকে তাদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হতে দিত না। একদিন আমরা সবাইমিলে অতলে তলিয়ে যাব। এবং এর জন্য দায়ী চিন বা পাকিস্তান নয়। বিধাতার অভিশাপে আমরা এমন সব নেতা পেয়েছি যারা লোভ চরিতার্থে ভারতটাকে বিক্রি করে দিচ্ছে।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ত্রয়েরর সঙ্গে যুক্ত আর্থিক অনিয়ম - বেনিয়মে অভিযুক্ত জর্জ স্বয়ং। অভিযুক্ত, জর্জের নিজস্ব পার্টি, সমতা দল।

।।চার ।।

ইন্দোর থেকে বাসে এসেছি ধার। বাসে ঘন্টা দুয়েক। জেলা - শহর থেকে মানোয়ারগামী বাসে নেমেছিলাম নাকা - চূনাভাটি। যেখান থেকে খেড়ি-বলওয়ারি গ্রাম। বাস স্টপেজ থেকে মিনিট ১০-১৫ মাত্র। ইন্দোর থেকে মান নদীর কূলে এই গ্রামে আসতে সময় গেল প্রায় ৪ ঘন্টা। গতকাল বারওয়ানি থেকে ইন্দোর ফিরে যেতে হয়েছিল। নাহলে বরওয়ানি থেকেই খেড়ি - বলওয়ারি গ্রামে ঘন্টা দুই আড়াইয়ের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যেত।

মানের ধারে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম, এখন যেখানে রয়েছি এই নদীকূলবর্তী অঞ্চল, দিন ১৫-২০ আগেই ছিল দু-তিন মানুষ

জলের তলায়। ডুবে গিয়েছিল ক্ষেতি, ঘর - বসত। এখন আবার সয়াবীন চারা সবুজ পাতা নিয়ে জেগে উঠেছে। টিপ টিপ বর্ষায় ভিজছে, দুলছে। গোটা ধার জেলাতেই এ-সময় সয়াবীন চাষ। ধার জেলাই বা বলি কেন। ইন্দোর থেকে ধার, বরওয়ানি বা উজ্জয়িনী যেখানেই গেছি, বাস রাস্তার দু'পাশ বরাবরই দেখেছি সয়াবীন ক্ষেত। আসার পথে আলাপ করছিলাম এক মাঝবয়সী কৃষকের সঙ্গে। মোটমুটি স্বচ্ছল, জমি ৩ হেক্টর। মানে ১৫ বিঘা।

জুনের শেষ সপ্তাহ বা জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই সয়াবীন চাষ শু হয়ে যায়। মার্চ - এপ্রিলে গম উঠে যাওয়ার পরপরই জমি চাষ। বর্ষায় বীজ ফেলা। চাষে সাধারণভাবে ট্র্যাক্টরই ব্যবহার করা হয়। কোথাও কোথাও হাল - লাঙল। ১ হেক্টর জমিতে সয়াবীন চাষ করতে ১ কুইন্টাল বা ১০০ কেজি বীজ লাগে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের বীজ নিগম কাউন্টার থেকে বীজ পাওয়া যায়। ১ কুইন্টাল ১০০০ টাকা। মোট খরচ ১১,০০০ টাকা। ক্ষেত থেকে সয়াবীন ওঠে অক্টোবরে। চাষে সময় ল াগে ৪ মাস। উৎপাদন, হেক্টর পিছু ২৫-২৬ কুইন্টাল। ওই সময় দাম থাকে ৮০০-১০০০ টাকা, কুইন্টাল প্রতি। অর্থাৎ বিক্রি বাবদ আসে, গড়ে ২২,৫০০ টাকা। হেক্টর প্রতি ১১.০০০ টাকা বাদ দিলে, উপার্জন হেক্টরে ১১,৫০০ টাকা

সয়াবীন উঠে গেলে নভেম্বর - ডিসেম্বরে গমের চাষ। ফসল উঠবে, মার্চ - এপ্রিল। ১ হেক্টর গম চাষে বীজ লাগে ২০০ কেজি, যার দাম ৮০০-৯০০ টাকা। চাষের খরচ, সয়াবীনের মতই । হেক্টরে হাজার দশেক। উৎপাদন হয় হেক্টর প্রতি ৫০-৬০ কুইন্টাল। চাষের সময় সয়াবীনের মতই ৪ মাস। কিন্তু খরচাখরচ বাদ দিয়ে লাভ থাকে হেক্টরে কমবেশি ২০,০০০ টাকা (মমের দাম থাকে মার্চ - এপ্রিলে ৬০০ টাকা কুইন্টাল)। অর্থাৎ গম চাষে লাভ বেশি।

গম চাষে একটাই প্রধান অসুবিধা। জল। সয়াবীন যেমন বর্ষার জল পায়, গম চাষে নলকূপ বসাতে হয়। জলের যোগান দিতে হয়।

এই কৃষকের খেতিবাড়ি ধারর জেলার গন্ধওয়ানি ব্লকে। ইনি চান, মান নদীতে বাঁধ দেওয়া হোক। গম চাষ ভাল হবে। কিন্তু ঘরওয়ালির আপত্তি। এই জেলারই মানোয়ার ব্লকেশ্বশুরবাড়ি। তাদের খেতিবাড়ির ওপর দিয়ে নাকি ক্যানাল যাবে।

নর্মদা ও তার ৪১৯টি শাখানদী - উপনদীর ওপর যে ৩০টি 'মেজর' বাঁধ প্রকল্পের কথা বলা আছে, মান তার অন্যতম। বিন্ধ্যপর্বতমালার পাদদেশ থেকে বের হয়ে এই নদী নর্মদায় মিশেছে। বাঁধ নির্মাণ হচ্ছে, ধার জেলার মানোয়ার ব্লকের জিরাবাদ গ্রামে। বাঁধ অবধি অববাহিকা অঞ্চল ৬৯০ বর্গ কিলোমিটার

১৯৮২ সালের প্রকল্প রিপোর্টে বলা হয়েছে, জলাধারে সঞ্চিত জলে ১৫,০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে। সেচযোগ্য জমি ১৯,২০০ হেক্টর অবধি ধাপে ধাপে বাড়ানো যাবে। প্রকল্পের অধীনে আসবে ধার জেলার ৪৮ টি গ্রাম। ম ান নদী প্রকল্পের খসড়া বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য ৫৩ টি গ্রামের কথা বলা আছে। মানোয়ার ব্লকের ২২টি গ্রাম আর গন্দওয়ানি ব্লকের ৩১টি। আবার নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের রিপোর্টে ৫৬ টি গ্রাম একেবারে নাম করে করে বলা আছে। সংখ্যায় লেখা হয়েছে ৫৭।

কমান্ড এলাকার উত্তরে বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশ, দক্ষিণে প্রস্তাবিত ওঙ্কারের বাঁধ - প্রকল্পের ডানদিকের ক্যানাল। ১৯৯৮ স ালের স্টেটাস রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৭টি গ্রামের ১০৯৪.৮৮৬ হেক্টর জমি জলাধারে চলে যাবে। ১৯৮২ সালের ধার প্রকল্প রিপোর্ট অনুযায়ী এর মধ্যে ৮৬৫ হেক্টর চাষের জমি এবং ৫৬০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১৯৯৮ সালের নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের রিপোর্টে অবশ্য চাষযোগ্য জমি, যা জলাধারে চলে যাবে, তার পরিমাপ বলা হয়েছে ৭০৮.০৮৬ হেক্টর। ক্যানাল কাটার জন্য আরও ২০০-২৫০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রকল্প ব্যয় প্রাথমিকভাবে ধরা হয়েছিল ৪৪.১ কোটি টাকা। পরে বেড়ে হয় ৮৮ কোটি টাকা আর এখন ১০৮.১২ কোটি টাকা (১৯৯৮ সালের টাকার মূল্যে)। প্রকল্পে নাবার্ডের ঋণ ১৯৯৭ সাল অবধি ৫৭.৬ কোটিটাকা।

প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের বিষয়টি প্রথম থেকে গুত্বহীন। এমনই অবস্থা যে এন ভি ডি -র ১৯৯৮ সালের স্টেটাস রিপোর্টে বলা আছে জলাধারের জন্য প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মোট সংখ্যা ৩৪৪ যার মধ্যে ২৬৬-টি পরিবারের পুনর্বাসন দেওয়া দরকার। এই হিসাব ১৯৮১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী। ১৯৯১ সেন্সস অনুযায়ী সংখ্যা হবে ২৬৬ নয় ৫৪৮। এই সংখ্যাও ওই রেপোর্টেই দেওয়া আছে। অথচ ১৯৯৭ সালে নাবার্ডকে যে হিসাব দেখানো হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে ২৬৬-টি পরিবারের পুনর্বাসন প্রয়োজন। ধার জেলার এল এ ও (ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিসার) বলেছেন ৮২৭ টি পরিবারের পুনর্বাসন প্রয়োজন। অর্থাৎ কোথায় এবং কীভাবে পুনর্বাসন হবে তাতো ঠিকই হয়নি। অথ

াঁৎ পুনর্বাসন দিতে হবে তাও প্রকল্প কর্তৃপক্ষের পরিষ্কারভাবে জানা নেই।
একইরকম অস্বচ্ছতা চাষ - জমির হিসাবে। জুলাই ১৯৮২-তে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে পেশ করা রিপোর্টে বলা হয়েছিল কমান্ড এলাকায় ৪০০০ হেক্টর জমি উদ্বৃত্ত আছে। এই জমি সিলিং (এই অঞ্চলে সেচ - জমির উর্ধসীমা ৭.৩ হেক্টর) বহির্ভূতভাবে দখল করে রেখেছে ৯৬৩ জন কৃষক। মান-প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের এইখানে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে তো বটেই এমনকি সর্দার সরোবর প্রকল্পের ১৫০০ জনের পুনর্বাসনও এই জমিতে সম্ভব।
৪০০০ হেক্টর জমি যদি সত্যিই উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হল না কেন? জলাধারের জন্য উৎখাত হওয়া ৮২৭টি পরিবারের আর ক্যানালের জন্য ২০০-২৫০ পরিবারের তো ওই ৪০০০ হেক্টরে পুনর্বাসন দেওয়া যেত। আসলে ওই জমিটিই নেই। উর্ধসীমার ওপরে জমির শতকরা ৯৫ ভাগই সরকার নিয়ে নিয়েছে কিন্তু তা দিয়ে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্তদের শতকরা ৫ ভাগেরও পুনর্বাসন হয়নি। ৮২৭ টি পরিবারের মধ্যে ২২টি পরিবারকে জমি দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু ১৪টি জমি অকৃষিযোগ্য আর ৮টি জমি আইনি গোলমালের অবস্থায়। ২০টি পরিবারকে ঘর তোলার জমি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সমস্ত জমিটাই কৃষি জমি।
কোথাও কোন আন্তরিকতা নেই। কেবল কেমন করে উৎখাত হওয়া মানুষগুলিকে ঠকিয়ে দেওয়া যায়। আইনের প্যাঁচে ফেলে দেওয়া যায়। বলা হল (১৯৯৮ সালের সেস্টাস রিপোর্টে) ১০ টি পরিবারের পুনর্বাসন সম্পূর্ণ। অথচ আসল ঘটনা, মান বাঁধ, মাটির বাঁধ। মাটি কাটা হচ্ছিল ভীমুড়া আর মাজালড়া - খেড়ি গ্রামে। ঠিকাদারের লোকেরা সাদা কথ ায় ওখান থেকে মানুষজনকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবেই যত কমানো যায়।
তাড়ানোর ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। সরকারি, বেসরকারি। সরকারি মানে যারা নির্মাণ কাজের বরাত দেয় আর বেসরকারি মানে যারা এইসব ঠিকোদারি পায়। কখনও কখনও এরা যৌথ ভাবে কাজ করে। যেমন, এখানকার যুবকেরা বলেছিল এই বলওয়ারি -খেড়িতে মাস দুয়েক আগে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে। অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের বদলি করে দিয়েছে। ৫টি হ্যান্ড পাম্প নষ্ট করে দিয়েছে। হুমকি তাই নয়, বলছে আমাদের নাকি গাছ ছাড়া আর সব সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়ে গেছে।
সর্দার - সরোবর বা নর্মদা - সাগর বাঁধ প্রকল্পের তুলনায় মান খুবই ছোট। মেগা বাঁধ নয় কোনো বহুমুখী পরিকল্পনা নেই এই বাঁধনিয়ে। নেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন লক্ষ্য। নেহাতি সেঁচ বাঁধ। খতিগ্রস্থ হবে ৮২৭টি পরিবার আর ক্যানাল বাবদ আর ২০০-২৫০। মোট হাজার পাঁচেক মানুষ জন। তাঁদের পুর্নবাসনের ব্যাবস্থাও করে উঠার সময় পাচ্ছে না সরকার, বাঁধ কর্তৃপক্ষ ।
অনেক দিন আগে, স্কুলের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের পোষ্টার মারতে বের হয়েছিলমা আমরা কয়েকজন স্কুল বন্ধু। স্কুল ছেড়েঅ ামরা তখন সবাই-ই বিবিদ্যালয়ে অথবা চাকুরিতে। আটা - মাখানো পোস্টার হাতে একটি ব্যারাক - বাড়ি সংলগ্ন এলাক ায় ঢুকে পড়তেই এক বন্ধু চিৎকার করে বলে উঠল, দুর! এখানে কোন মানুষ থাকে নাকি? সবাই তো উড়ে। মান প্রকল্পে উদ্বাস্তু মানুষজন ভীল ভীলালা জনজাতি।
।। পাঁচ ।।
খেড়ি - বলওয়ারিতে মান নদীর জলে পা ডুবিয়ে একটা বড় পাথরে বসে দেখি, উল্টো পাড়ে, ডান দিকের কোণ ঘেঁসে বঁ াধেরজলনিকাশি ব্যবস্থার কংক্রিট দেওয়াল নির্মাণ চলছে। দেখছি, একের পর এক লরি যাওয়া - আসার দীর্ঘ লাইন।
মান প্রকল্প পরিবেশগত ছাড়পত্র পায় ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে। শর্তাধীন। মূল শর্ত ছিল যে সব জায়গা খোঁড়া হয়েছে তাভরাট করে দেওয়া এবং খাড়াইয়ে বৃক্ষরোপন, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের কৃষিযোগ্য অঞ্চলে পুনর্বাসন, জলধারা ও ক্যানালের দু-পাড় বরাবর বৃক্ষরোপন বৃক্ষচ্ছেদ রদ করতে এলাকার মানুষজনের পাহারাদারি চালু করা, বনাঞ্চলে ৫০০০ মিটার ও অন্যত্র ৫০ মিটার বিস্তৃত সবুজ বনানী তৈরি করা ভূমিক্ষয় এড়াবার জন্যে। কোন কাজই হল না। ফলে ১৯৯৪ সালে এনভায়রন মিনিষ্ট্রির তরফে মান প্রকল্পকে ‘ব্ল্যাক লিস্টেড’ করে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ১৯৯৭ স ালে এলাকার মানুষজনকে উচ্ছেদ নোটিশ ধরিয়ে দেয়। ক্ষতিগস্ত মানুষজন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন-এর পতাকাতলে নিজেদের সংগঠিত করে। বিকল্প প্রস্তাব দেয়। লাভক্ষতির খতিয়ান পেশ করে। জলাধার যে ১৫০০০ হেক্টর জমি সেচযে াগ্য করবে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই জায়গার সেচের জন্য, উন্নয়নের জন্য, তারা জানায় ভৌম জলই শুধু নয়

ভুগর্ভস্থ জলেরও সংরক্ষণ প্রয়োজন। বাঁধ ও জলাধার বাতিল করে ঝাবুয়া জেলায় হাথনি নদী থেকে গ্রামবাসীরা যেভাবে জল তোলে, সেই ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। ধার জেলায় খরা হয় পাঁচবছরে একবার, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮০০ মিমি। সুতরাং ভূগর্ভস্থ জলের ঠিক ব্যবহারের ওপর তারা জোর দেয়। ঠিক ঠিক স্থান নির্বাচন করে ডাসভি গ্রামের মানুষজন যেমন পুকুর কাটা প্রস্তাব দিয়েছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে সর্বত্র সেই ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করে কুয়ো খোঁড়ার কথা বলে। এ- বিষয়ে কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রে স্বাধ্যায় পরিবার যেমন ১০ লাখ কুয়ো জল ভর্তি করে রাখার ব্যবস্থা করেছে অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে প্রস্তাব দেয়। তারা বলে এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে রবি শস্য চাষের আর কোন অসুবিধা হবে না। এই সব প্রস্তাব কোনটাই মানা হয়নি। দীর্ঘ সংগ্রামের পর১৯৯৯ সালে মধ্যপ্রদেশ সরকার একটি নতুন কমিটি গঠন করে। কমিটিতে থাকে এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি, সরকারি অফিসার ও নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কর্মী। মে মাসে এই কমিটি সিদ্ধান্তে আসে, পুনর্বাসন না হওয়া অবধি নির্মাণ কাজ স্থগিত থাকবে। সিদ্ধান্তউপেক্ষা করেই ২০০০ সালে অক্টোবরে আবার কাজ শু হয়ে যায়। ২০০১ সালের ২৪শে জানুয়ারি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজন ধার ও ইন্দোর শহরে নির্মাণ কাজের বিদ্ধে মিছিল আন্দোলন শু করে। ৩০শে জানুয়ারি সরকার কাজ স্থগিত রাখার আদেশ দেয়। বাস্তবে অবশ্য এই আদেশ কার্যকর করতে নির্মাণস্থলেই লাগাতার বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। ফেব্রয়ারি মাসে প্রায় ২০০ জন আদিবাসি আন্দোলনকারী ১৫ দিনের জন্য কারাদ্ধ হন। জুলাই থেকে আবার নির্মাণ কাজ শু হয়েছে।

যুবকেরা বলছিলেন, মাঝে মাঝেই জল আটকে ডুবিয়ে দিচ্ছে এলাকা। কিছুকাল আগেই জল উঠেছিল দু- তিন মানুষ। সব ডুবে গিয়েছিল। আবার নিকাশি গেট খুলে জল বের করে দিয়েছে। জল হচ্ছে। জল নেমে যাচ্ছে। একদিন আর নামবে না। এইসব অঞ্চল হয়ে যাবে জলাধার। ঘর বাড়ি খেতিচ্যুত হব আমরা ৫ হাজারেরও বেশি মানুষজন, এখানকার আদি বাসিন্দা।

অথচ আমার বন্ধু - বান্ধব আত্মীয় - স্বজন প্রায় সবাই-ই এমত বাঁধ নির্মাণের পক্ষপাতি। উন্নয়নের কোন বিকল্প পথ নেই, এই তাদের বিশ্বাস। সরকার বলে, পুনর্বাসন দেওয়া হয়ে গেছে। রেডিও টিভি সংবাদপত্রে বারবার প্রকাশিত হয় সরকারি ভাষ্য। একসময় সবাই বিশ্বাস করে তাহলে নিশ্চয়ই পুনর্বাসন হয়ে গেছে। বাঁধের অনুকূলে মতামত তৈরি হয়, 'কনস্টেন ম্যানুফ্যাকচারড' হয়। মন ও চোখের আড়ালে চলে যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের ছবি। একদিন আর স্মরণেই আসে না। ভাখরা - নাঙ্গাল বাঁধের ঐর্য দেখতে দেখতে স্মরণই করতে পারি না যে, আজ ৪০ বছর পরও সেখানকার ৭০০০ বাস্তুচ্যুত মানুষজনের প্রকৃত অর্থে কোন পুনর্বাসন হয়নি। (মাত্র কিছুকাল আগে রাজ্যসভায় সাংসদ কুলদীপ নায়ার এই তথ্য - পরিসংখ্যান দিয়েছেন।) উন্নয়ন! কিন্তু কাদের বিনিময়ে? যারা বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন, হারাচ্ছেন জমি জিরেত খেতি, তারা কি ভারতবাসী নন? ৫০-৫২ বছরে ৫.৬ কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে গেলেন নিজেদের জমি থেকে,সম্প্রদায় থেকে, তাদের বেশিরভাগ এই ভারতেরই আদি জনগোষ্ঠি। ভারত সভ্যতার বিকাশ এদের হাত ধরেই।

আসলে আমরা গগনচুম্বী উন্নয়নে বিশ্বাসী। আমরা সেই উন্নয়নে বিশ্বাসী, যে উন্নয়নের দাপট আছে, বিশাল সৌধ আছে, দম্ভ আছে, যা আমাদের হতবাক করে দেয়, দমন করার আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি ঘটায়।

সজ্জনের কথা মনে পড়ে যায়। খেড়ি-বলওয়ারি আসার সময় বাসে আলাপ। পদবীর কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। জাতে কুমোর। বাড়ি, উজ্জয়িনী। সামাজিক অবস্থানে, প্রান্তিক। কুয়ো আলাদা। বৈবাহিক সম্পর্ক শুধু নিজেদের মধ্যেই।

সজ্জন বাস বদল করে যাবে আমেদাবাদ। ছুটি নিয়ে দেশে এসেছিল। ৭দিনের ছুটি। বাড়িতে বৌ, দুই ছেলে এক মেয়ে। সজ্জনেরা ৪ ভাই ১ বোন। বোনেরশ্বশুরবাড়ি ধার জেলায়। বাবা আর এক ভাই এখনও কুমোরের কাজ করে। অন্য দুভাইয়ের একজন খেতি দেখাশোনা করে আর অন্যজন চন্দ্রপুরা থার্মালে কাজ করে। দেশের বাড়িতে সবাই পাশাপাশি থাকে। রান্নাবান্না আলাদা। বাবা মা, কুমোর ভাইয়ের সঙ্গে থাকে। এবার দেশে এসে সজ্জন ৭ হাজার টাকায় ২ বিঘে টাঁড় জমি কিনেছে।

সজ্জন ভূপালের কাছে এক পাথর - খাদানে কাজ করত। ওখানেই শেখে ডিনামাইট জেল - স্টিক দিয়ে পাহাড় ব্লাস্ট করার কাজ। সেই কাজেই সজ্জন দক্ষ হয়ে ওঠে। কয়েকমাস আগে এক ঠিকাদারের সঙ্গে গুজরাট। ভূমিকম্প বিধবস্ত অঞ্চলে বহুতল বাড়ি ভাঙার কাজ। ডিনামাইট দিয়ে ব্লাস্ট করা।

বর্ণনা দিতে দিতে সজ্জনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। চলন্ত বাসের মধ্যেই ওর শরীর হয়ে ওঠছিল টানটান। মধ্য -

ত্রিশের সজ্জনের মুখে তখন কথার খই। এখন ওর মাসে ৫ হাজার টাকা রোজকার। খাদানে পেত দেড় হাজার।
এমনভাবে ৪-৫ তলা বাড়ি ভাঙতে পারে যে, সজ্জন যেদিকে ঠিক করবে বাড়ি সেদিকেই হেলবে। একটু এপাশ ওপাশ হবে না। ওর আঘাত লাগার কোন ভয়ই নেই। কখনও কখনও ছিটকে আসে অবশ্য হাড় বা মানুষের শরীরের কোনও খণ্ড। সজ্জনের তেমন কিছুমনে হয় না। কষ্ট হয় না। সজ্জানদের জাতের কেউ ওসব বাড়িতে থাকত না, থাকে না। বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে সজ্জন আনন্দ পায়।

।। ছয় ।।

নদীপার থেকে সত্যাগ্রহ মঞ্চ বেশি দূরে নয়। তবে অনেকটাই উঁচুতে। সেখানে ক্ষেতের ধার ঘেঁসে এক চালাঘরের উঠোনে সত্যাগ্রহীরা অর্ধচন্দ্রাকারে বসে আছে জনা ৫০। বেশিরভাগই মেয়ে, বৌ। জনা ১০-১৫ পুষ। পুষদের সবারই মাথায় মস্ত বড় পাগড়ি। ঝোলা গোঁফ। এরা বসে আছে পেছনের সারিতে। একবারে সামনে, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের ব্যানারের নীচে, সামনের দিকে মুখ করে এলাকার অন্যতম সংগঠক চিত্ররূপা। চিত্ররূপা পালিত, ডাকনাম সিলভি। প্রবাসী বাঙালি। বেশ কিছু বছর ধরেই চিত্ররূপা এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে। গতকাল বাবা আমতের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল চিত্ররূপাই। চিত্ররূপার পাশে ঔপনাসিক ও নিবন্ধকার অন্ধতী রায়। গতকাল গভীর রাতে অন্ধতী বরওয়ানি পৌঁছেছেন। আজ বেলায় এই এলাকায়। ছোটোখাটো চেহারা। এখানে বেশ পরিচিতই।
আলোচনা হচ্ছিল ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে। সরকারি দপ্তর থেকে বলা হয়েছে চারপাশে কোন অনাবাদি কিন্তু চাষযোগ্য জমি পাওয়া গেলে, জমি কেনার টাকা সরকার দেবে। কয়েকজন যুবক সেই সব জমির হদিশ এনেছে। মাটির নমুনাও জমা পড়ল সভাস্থলে। সত্যি সত্যিই সরকার জমি কেনার টাকা দেবে এমন বিশ্বাস প্রায় কারই নেই। তবুও কথা হল। সরকারি দপ্তরে যাওয়ার জন্য এক প্রতিনিধিদল গঠন করা হল। ছেলে মেয়ে সমান সমান। এক এক এলাকা থেকে এক একজন।
নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সর্বত্রই এই একই রেওয়াজ। যৌথ সিদ্ধান্তের অংশীদার করে নেওয়া। গত বছর ডোমখেড়ি জলসিন্ধি এলাকা (নর্মদার আরও নীচের দিকে দুটি গ্রাম, জলাধারে তলিয়ে যাবে। ওখানে প্রবীর সমীর আমি গিয়েছিলাম বরোদা হয়ে। সুবিখাতহাজের মন্দিরের সামনে থেকে লঞ্চে)-য়ও এইভাবে সভা পরিচালিত হতে দেখি। কিন্তু আজকের এই সত্যাগ্রহ সভায় অথবা বরওয়ানির সত্যাগ্রহে আদিবাসিদের স্বতঃস্ফূর্তির অভাব দেখলাম? গত বছর বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা যুব ছাত্রদের সংখ্যা এবং উৎসাহে কিকিঞ্চিৎ ভাটা? নর্মদা আন্দোলন কি আগের চেয়ে স্তিমিত?
প্রাথমিকভাবে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্তদের ঠিক ঠিক পুনর্বাসন দেওয়ার দাবিতেই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন গড়ে উঠলেও কিছুকালের মধ্যেই আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ হয়ে ওঠে সুবৃহৎ কেন্দ্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, যে সব পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতেই এই মেগা বাঁধ।বড় বাঁধ বাএই ধরনের বৃহৎ কেন্দ্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সামাজিক অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান সংগ্রহ করে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। অবশ্য এই সময়ে ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে এই সব তথ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছিলেন। এমনকি সুবৃহৎ উন্নয়নপন্থী অনেক সংগঠনও যেমন ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউট।
১৯৮৭ সাল নাগাদই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে সর্দার সরোবরের বিদ্ধে আন্দোলন শুধুমাত্র নর্মদা উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সুতরাং ভারত ও ভারতের বাইরেও মধ্যবিত্ত ও উচচমধ্যবিত্ত নাগরিক মানুষজনকে এই আন্দোলনের সপক্ষে আনার চেষ্টা শু হয়। এখান থেকেই শু হয় সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গিরও এক দোলাচল। একদিকে প্রকল্পে উচ্ছেদ হতে যাওয়া মানুষজন যাদের অধিকাংশই ভীল এবং দলিত কৃষক ও চাষী আর অন্যদিকে মধ্য ও উচচবিত্তের নাগরিক মানুষজন। প্রথমোত্ত মানুষজন লড়ছেন তাদের জীবন ও জীবিকার জন্যে, যারা জানেন না কেন এই বাঁধ আর দ্বিতীয়োত্তদের আন্দোলনে সামিল হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন সব কারণ, যেমন উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া মানুষদের দুঃদুর্দশা অথবা আদি জনগোষ্ঠির জীবনযাপন ও জীবনচর্চা অক্ষুণ্ণ রাখার রোমান্টিক ধারণা অথবা পরিবেশ সংরক্ষণ অথবা নিজের র‍্যাডিকাল চিন্তার প্রতি বিশ্বস্ততায়, ভালবাসা থেকে সাধ্যমতো এক কর্মযজ্ঞে অংশ নেওযা। এদের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে থাকে প্রধানত উচ্ছেদ না হওয়া মধ্যবিত্তের সত্রিয় কর্মীরা যারা এই ধরনের বাঁধ ও উন্নয়ন বিরোধী এবং বিকল্প উন্নয়ন ও বিকল্প শাসন পদ্ধতির মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত। ফলে দুভাগে আন্দোলন শু হয়। উপত্যকা এবং সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়া কেন্দ্র, যেমন ভূপাল, মুম্বাই, দিল্লির নাগরিক মানুষজন, সংবাদ মাধ্যম এবং নীতি নির্ধারকদের মধ্যে প্রচার ও জনমত তৈরির প্রচেষ্টা।

আন্দোলন ব্যাপক ও বিস্তৃত হয় ১৯৮৯ সালের অক্টোবর এর হরসুদ সমাবেশ থেকে। ধবংস বনাম নির্মাণ সমাবেশ। ২৮ শে সেপ্টেম্বর হাজার হাজার আদিবাসি সহ ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও পেশার মানুষজন এই সমাবেশে যোগ দেন। মধ্যপ্রদেশের হরসুদ শহর বাছা হয়েছিলএই কারণে যে, প্রকল্পে দশ হাজার মানুষজনের এই শহর জলে তলিয়ে যাবে। সমাবেশের আহ্ বায়ক ছিলেন, বাবা আমতে, সুন্দরলালা বহুগুণা, ড শিবরাম করন্থ, মেধা পটকর, ভি এম তারকুণ্ডে, শাবানা আজমি সহ অনেক বিশিষ্ট মানুষজন। গুজরাট থেকেও বাঁধ ও ক্যানালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা এই সমাবেশে যোগ দেন। এই সম াবেশের ধারাবাহিকতাতেই গড়ে ওঠে ধবংসাত্মক উন্নয়নের বিদ্ধে আর একটি গণসংগঠন 'জন - বিকাশ আন্দোলন'।

১৯৯০-এর বর্ষার সময় সর্দার সরোবর বাঁধের ভিত গড়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। বর্ষার শেষ থেকেই বাঁধ উঠবে, সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অর্থাৎ স্থগিত রাখতে হবে না। পরিণতিতে ১৯৯০ এর ডিসেম্বর ও ১৯৯১ এর জ ানুয়ারির 'সংঘর্ষ যাত্রা'। উপত্যকার হাজার হাজার মানুষ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ এই ক ার্যত্রমে অংশ নেন। সংবাদ মাধ্যমের প্রধান খবর হয়েওঠে এই সংঘর্ষ যাত্রা। মধ্যপ্রদেশে রাজঘাট শহর থেকে সর্দার সরে াবর অবধি দীর্ঘযাত্রা। ৮ দিন ধরে চলমান মিছিল গুজরাট সীমান্তের ফেরকুয়া গ্রামে পৌঁছুলে মিছিলের গতিরোধ করে গুজরাট পুলিশ ও সরকারি উদ্যোগে গঠিত এক সমাবেশ। পুলিশ লাঠিচার্জ করে।১৪০ জনকে গেপ্তার করে। মেধা, আ দিবাসি নেতা খাজিয়াভাউ সহ ৬ জন অনশন শু করে ওখানেই। গুজরাট সরকার কোন কথাই শোনে না। অনশন প্রত্যাহ ৃত হয় ২২ দিনের মাথায়। মেধা ঘোষণা করেন, মিছিল ও সত্যাগ্রহ তুলে নিয়ে মানুষজন নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যাবেন। শ্লোগান দেন 'হামরা গাঁও মেঁ হামারা রাজ'।

নর্মদা আন্দোলনের বড়সড় এক সংকটের সময় এটাই। মধ্যপ্রদেশও মহারাষ্ট্রের কিছু কিছু আদিবাসি মানুষজন মনে করলেন, বাঁধ আর বন্ধ করা যাবে না। বাঁধ যখন বন্ধ হবে না তখন ক্ষতিস্বীকার করেই পুনর্বাসনের চেষ্টা করা উচিত। ঘটন াও খানিকটা সেদিকেইঘটে।

'সংঘর্ষ যাত্রা'র সাময়িক ব্যর্থতার পর পরবর্তী ধাপের কর্মসূচীর জন্য পর্যালোচনা শু হয়। কয়েকজন কর্মী মনে করেন, এই আন্দোলনের লক্ষ্য যেহেতু রাষ্ট্রকাঠামোয় বেশ কিছু পরিবর্তন, কেননা এ ছাড়া এই সুবৃহৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা রদ হবে না সুতরাং নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের উচিত, বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজন ছাড়াও উপত্যকার এবং কাছাকাছি পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব গুজরাট এবং উত্তর মহারাষ্ট্রের নিপীড়িত মানুষজনকে নিয়ে একটি বৃহত্তর সংগ্রামী মঞ্চ গঠন করা। সবাই যেহেতু বাঁধে খতিগ্রস্ত নয় সুতরাং অঞ্চলের জীবন জীবিকা যে যে কারনের জন্য বিপর্যস্ত, সবই মঞ্চের আন্দোলন সূচী হে াক। মেধা ও অন্যান্য সত্রিয় কর্মীদের বত্তব্য ছিল, এর ফলে সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করার কর্মসূচী গুত্ব হারিয়ে ফেলবে সুতরাং এখনই ওই ধরনের বৃহত্তর পরিকল্পনা নেওয়া অনুচিত। খেড়ুট মজদুর চেতনা সংগত (কে এম সি এস,) এন - বি - এ-র সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে। অবশ্য এখনও কে - এম - সি- এস, সর্দার সরোবর সংত্রান্ত এন - বি - এ-র কর্মসূচী সমর্থন করে। এই সংগঠনটি এখন আলিরাজপুর ব্লকের ভীলদের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, সর্দার সরোবর বাঁধ - প্রকল্পের বিদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। মধ্যবিত্ত উচচবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আন্দোলনের প্রভাব আরও বাড়ে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রকল্প থেকে সরে যায়। সুপ্রিম কোর্টও ১৯৯৫ সালে নির্মাণ কাজের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। যুক্তি, পুনর্বাসন প্রকল্প যথেষ্ট নয়।

খুবই সম্ভব এই পর্যায়ে আন্দোলনের ক্ষেত্রে আর একটি পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন স্তরও পেশার নাগরিক মানুষজনের মধ্যে প্রচার চালানোর ক্ষেত্রে বা আদালতে আইনী পদক্ষেপ নিতে আদিবাসি মানুষজন অনভ্যস্ত। এমনিতেই সংঘর্ষ যাত্রার স ামায়িক ব্যর্থতায় তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মনোবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার ওপর এলাকায় আন্দোলনসূচী তেমন জোরদার না হওয়ায় তারা খানিকটা দর্শকের ভূমিকায় চলে আসেন। যদিও ১৯৯৩ সালে মহারাষ্ট্রের গ্রাম মনিবেলি জলাধারের জলে ডুবতে থাকার সময় শ'য়ে শ'য়ে সাধারণ মানুষ সত্যাগ্রহী হ'ন, 'ডুবে যাব তবু ভিটেমাটি ছেড়ে যাব না' শ্লোগান অ াঁকড়ে ধরেন, তবুও সরকার যে এই পর্যন্ত এগোতে সাহসী হয় তার কারণ মহারাষ্ট্রের উচ্ছেদ হওয়া বেশ কিছু মানুষ, সরকার প্রদত্ত আক্কালকুভা ব্লকে পুনর্বাসনে রাজি হয়ে যায় ৯২ সালের গোড়াতেই। মহারাষ্ট্রের সাভরিয়া গ্রামের আ দিবাসি নেতা খাজিয়াভাউ -ও পুনর্বাসন শিবিরে চলে যান। অবশ্য নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সঙ্গে লুহারিয়া, রাভা, ভা নিয়া, খাজানের মতো প্রথম সারির আদিবাসি নেতারা থেকে গেছেন।

১৯৯৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট বাঁধের উচচতা ৮০ মিটার থেকে বাড়িয়ে ৮৫ মিটার ও ৩ মিটার হাম্প সহ মোট ৮৮ মিটার করার অনুমতি দেয়। ১১ই আগস্ট জলাধারের জলে ডুবে যেতে থাকা জলসিন্ধির গ্রামে 'ডুবে যাব তবু ভিটেমাটি ছেড়ে যাব না' সংকল্প ভাবনায় মেধা, কোমর ছাড়িয়ে বুক অবধি জলে ১২ ঘন্টারও বেশি সত্যাগ্রহ অবস্থানে ছিলেন। পরে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আদিবাসি মানুষজন কিন্তু প্রায় দর্শকই থেকে গেছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। নিশ্চিত হতে থাকে যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ পাওয়া যাবে না। এবং সেই রায়ই ঘোষিত হয়েছে ২০০০ সালের ১৮ই অক্টোবর।

মান নদী - বাঁধ প্রকল্পের বিদ্ধে এই সত্যাগ্রহ অবস্থানে যে ৫০-৫৫ জন মানুষ বসে আছেন, আলোচনা করেছেন, আমরা কয়েকজন বাদে সবাই ভীল বা ভীলালা। আগেরবার ডোমখেড়ি সমাবেশেও দেখেছি উপস্থিত মানুষজনের শতকরা ৯০-৯৫ ভাগই আদি জনগোষ্ঠিভুক্ত মানুষ। আগেরবার ওই এলাকার আন্দোলন পরিচালিত স্কুলে দেখেছি শিক্ষক, আদিবাসি সম্প্রদায়েরই। শ'দুই - আড়াই বাচচাদের নিয়ে আবাসিক বিদ্যালয়টির প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের যোগান আসে আদিবাসি কৃষকদের ক্ষেত থেকেই। সমাবেশে উপস্থিত মানুষজনের রান্না, খেতে দেওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থা করেন দূরদূরান্তের গাঁও থেকে আসা মা, মাসি, বৌয়েরা।

নিশ্চিতভাবেই এটা ঠিক, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মূল জমি এখনও উচ্ছেদ হতে থাকা বাঁধ - ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজন। আবার এও অভিযোগ যে, মধ্যপ্রদেশের আদিবাসি বিচার সংগঠন, খেড়ুত মজদুর চেতনা সংগত (কে - এম-সি-এস), আদিবাসি বিচার সংগঠন, আদিবাসি মোর্চা সংগঠনের মত সব সংগঠনের সঙ্গে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের দূরত্বও বেড়েছে।

মতাদর্শগত প্রশ্নও জটিলতা এসেছে। গান্ধি প্রদর্শিত পথ ও চিন্তা বনাম বিপ্লবী মার্কসবাদী চিন্তা। প্রশ্ন উঠেছে আন্দোলনের 'নিয়ামক দলে' আদিবাসিদের অংশগ্রহণ ও মতামত সুনিশ্চিত করার মতো গুত্বপূর্ণ বিষয়েও। এমন কথাও উঠেছে যে গান্ধি প্রধানত হিন্দুত্বের প্রতীক সুতরাং এই মত ও পথে আদিবাসি ভীলদের সংগ্রাম পরিচালনা করে যাওয়া কি একটি বিযুক্ত ভাবাদর্শ আরোপিত করা নয়?

।। সাত ।।

মান নদীকে পেছনে ফেলে এবার আবার বরওয়ানির পথে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি। বৃষ্টি এ যাত্রায় প্রায় সমসময়ের সঙ্গী। বরওয়ানি ফিরে যাবার আমরা প্রায় জনা দশেক। এলাকায় কয়েকজন যুবক কিশোর, যারা আমাকে নদীকূলে নিয়ে গিয়েছিল, জানিয়েছিল ওদের ঘরদুয়ার খেতির কথা, পরিচয় করিয়েছিল ওদের মাটি ফসল টিলা পাহাড়ের সঙ্গে, ওরাও এসেছে বাসে তুলে দিতে। আর হয়ত কোনদিনই দেখা হবে না। ডুবে যাবে, তলিয়ে যাবে এই গোটা জনপদ মানের জলাধারে, ওরা নিজেরাও আলাদা আলাদা হয়ে যাবে।

ভীলদের ভারি সুন্দর এক সংগ্রামী ঐতিহ্য আছে। ১৮৫৭-৬০-এ বৃটিশ রাজের বিদ্ধে ভীলেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি বৃটিশদের স্বস্তি দেয় নি এই জনজাতি। তাঁতিয়া ভীল, চিতু কিরার শহীদ হয়ে এই জনজাতির স্বাধীনতাস্পৃহার প্রমাণ রেখেছিল। সেদিন ছিল এরা ঐক্যবদ্ধ। এক বিস্তৃত টানা ভূখণ্ডে এদের অবাধ গতিবিধি। তারপর কোণঠাসা হতে হতে ক্রমশই হারিয়ে যেতে বসেছিল সচলতা। আবার রথের রাশিতে টান পড়েছে।। বর্তমানে এই সমাজে উদ্বৃত্ত উৎপাদনই শুধু পণ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে না, পণ্যও উৎপাদিত হচ্ছে বাজারের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে জনজীবনে। আধুনিক জীবনযাত্রার অপরিচিতি থেকে মুক্ত হতে চাইছে জনপদবাসী। সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে বৃহত্তর জনজীবনে প্রবেশ করার পথে, প্রাণের সচলতায় তার অস্থিরতা বেড়েছে। ঐক্যবদ্ধ হতে চাইছে। এমত অবস্থায় নর্মদা পরিকল্পনা এদের এক বৃহৎ অংশকেই আলাদা আলাদা করে দেবে। যারা পুনর্বাসন পারে তারা কে কোথায় ছিটকে পড়বে তার স্থিরতা নেই। নর্মদা পরিকল্পনা যদি সফল হয় তবে এই জনজাতি জমির অধিকার, বনাঞ্চলের অধিকার, আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার অধিকার, শিক্ষার অধিকার নিয়ে সংঘবদ্ধ হওয়া যে সব প্রচেষ্টা নিচ্ছে তার ওপর বেশ বড়সড় আঘাত আসবে। এদের সবকটি সংগঠন খুবই সক্রিয় উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে, মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে।

বরওয়ানিতে একটি কলেজ আছে। বি. জে, কলেজ। দেবী অহল্যাবাঈ বিশ্বিদ্যালয়ের অধীন এই কলেজে বি . এস - সি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রাকেশ যাদবের কাছে খোঁজ নিচ্ছিলাম এলাকার ফসল, দৈনিক মজুরি ইত্যাদি বিষয়ে। ওদের বাড়ি জমি জিরেতের কথাই রাকেশ শোনাল। রাকেশরা অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। গ্রামের নাম টিকরি, জেলা বরওয়ানি। লেখাপড়ার জন্যে রাকেশ হোস্টেলে থাকে,পাতিদার সমাজ ছাত্রাবাস। ছুটিতে বাড়ি যায়। ক্ষেত্রের কাজ দেখে। বাড়ি থেকে ছ

াত্রাবাসে ফিরছিল। সেই বাসেই আমরা বরওয়ানি যাচ্ছিলাম।

মঙ্গুরাম যাদব (কৃষক)

কাশিরাম যাদব (কৃষক)

কালুরাম যাদব (পি.এ) তুসলীরাম যাবদ (আইনজীবী)
(জমির পরিমাণ ৩০০ বিঘা) (জমির পরিমাণ ৩০০ বিঘা)

রাকেশ যাদব মুনিয়া যাদব দোলুরাম যাদব
২০ বছর (১৪ বছর, স্কুলে পড়ে) (২৬ বছর, এম. এস - সি
(বি.এস-সি,২য় বর্ষ) (ফিজিক্স, গবেষণা প্রায় শেষ)

কালুরাম যাবদ ও তুলসীরাম যাদবের মোট ৬০০ বিঘা জমির সেচ নর্মদা-র জলে। টিকরি গ্রাম থেকে নর্মদা ১৪-১৫ কিলোমিটার। পাইপলাইনে জল আসে। তার জন্য ২০ হর্সপাওয়ারের তিনটি পাম্প বাসন আছে। একটি দিয়ে নর্মদা থেকে জল তোলা হয় আর দুটি বুস্টার পাম্প। নর্মদাতে লোক থাকে। বুস্টার পাম্প দুটি স্বয়ংক্রিয়। রাস্তার ধারে দিয়ে প াইপ লাইন। পাহাড়ি রাস্তা উঁচু নীচু। তাই বুস্টার পাম্প। সমস্ত কিছু ওদের নিজস্ব। পারিবারিক। কখনও কখনও এই জল অন্যদের দেওয়া হয়। ঘন্টায় ১০০ টাকা। ১ বিঘা চাষ করতে এখানে ১৫ ঘন্টা পরিমাণ জল লাগে।
জমি উর্বর। মূল চাষ গম ভুট্টা আখ কার্পাস। সব রকম ডাল হয়, সর্ষে হয়। তবে এসব কম। কোন তরিতরকারি চাষ হয় ন া।
রাকেশদের ট্রাক্টর আছে। চাষ - খামার দেখাশোনার জন্যে দুজন স্থায়ী কর্মচারি আছে। বার্ষিক বেতন ২০,০০০ টাকা করে। কর্মচারিরা যে যার নিজের বাড়িতে থাকে। নিজেদের বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া।
অস্থায়ী দিন - মজুর লাগে খুব কম হলেও প্রতিদিন ৫০ জন। চাষের সময় আরও অনেক বেশি। সকাল ৮টা থেকে বেলা ৩টে। দিন - মজুরদের মজুরি দৈনিক ২০ টাকা, টিফিন বিড়ি কিছুই দিতে হয় না। সবাই আদিবাসি।
রাকেশদের গাড়ি দুটি। একটি অ্যামবাসাডর আর হাল আমলে একটি মাতি এস্টিম কেনা হয়েছে।
সর্দার সরোবরের জলাধার সম্পূর্ণ হলে রাকেশদের জমি বাড়ি জলের তলায় তলিয়ে যাবে। ওদের গুজরাটে জমি দেওযা হবে।
রাকেশ ওর জাঠতুতো দাদা, দলুরাম যাদবের মতই ফিজিক্সে এম. এস - সি করে গবেষণা করবে। এখানে রাকেশ পড়ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ও ফান্ডামেন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজ (হিন্দি ও ইংরাজি) নিয়ে। অংক ছাড়াও ফিজিক্সে এম . এস - সি করা যায়। দলুরামও তাই করেছে। তিনবছরে ফাইনাল পরীক্ষা। মোট নম্বর ১২০০। কমপিউটার শেখে কলেজে।
রাকেশ নর্মদা নিয়ে কোন আন্দোলনেই কোন দিন যায়নি। ছুটি পেলেই বাড়ি চলে যায়। ক্ষেত দেখাশোনা করে। রাকেশের বাবা কখনও কখনও সভায় গেছে। মেধা-র নাম জানে। বাবা আমতের নাম রাকেশ আগেই শুনেছে।

।। আট ।।
নর্মদা - আন্দোলনে এবার কিংবা আগেরবার যেখানেই গেছি, সত্যাগ্রহ মঞ্চ অথবা জমায়েত কিংবা ঘরের দাওয়ার আল াপচারি আন্দোলনের মানুষজন, সর্বত্রই মেয়ে বৌ বোন মা মাসিদের সংখ্যাধিক্য। পুষেরা ব্যস্ত তাদের খেতি নিয়ে বিকাল শেষের জমায়েতেইতাদের উপস্থিতি বেশি। সারাদিনের আন্দোলন - আলোড়নে পুষেরা অবশ্যই আছে তবে মেয়েদের তুলনায় এদের উৎসাহ কম।

নর্মদা আন্দোলন, বাঁধ - প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের পুনর্বাসন আন্দোলন; নর্মদা আন্দোলন, সর্দার সরোবর বাঁধ - প্রকল্প বন্ধ করার দাবিতে আন্দোলন; নর্মদা আন্দোলন, ধবংসকারি উন্নয়ন চিন্তা চেতনা পরিকল্পনা আন্দোলন কিন্তু সর্বোপরি নর্মদা আন্দোলন খুব সম্ভব এক নদী আন্দোলন।

নদী সাধারণভাবে আমাদের কাছে, নাগরিক চিন্তায় জলের যোগানদার। নদী শুকিয়ে গেলে জল পাব না অর্থাৎ চাষ হবে না অথবা পরিবহন বিপর্যস্ত হবে, এমনই সব ভাবনা। নদী যে কোন অর্থেই রিসোর্স। নদীর জল সাগরে বয়ে যায়। মিষ্টি জল লবনাক্ত হয়। নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং নদীর জল কংক্রিটের দেওয়াল দিয়ে আটকে রাখ।

গাঁ - গ্রামে মেয়েদের কাছে নদী এক ভিন্ন অর্থ বহন করে। সকালে নদী থেকে জল আনা। পরিবারের রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া, সারাদিনের সবার দেখভালের প্রয়োজনে, নদী। নদী কলসি হাঁড়ি সবই প্রতিদিনের জীবনচর্চার সঙ্গে মেখে থাকে। নদী মানে প্রতিদিন একসঙ্গে সবাই মিলে যেখানে যায়। নদী মানে গাঁ - গ্রামের প্রতিদিনকার ঘরকন্নার সুখদুঃখের আদানপ্রদান। নদী মানে অবগাহন স্নান। নর্মদা মা, নর্মদা সখীও।

নদী বাঁধা পড়বে, নদী জলাশয় হবে এ অতীব কষ্টকর। প্রাণ - থেকেই সায় মেলে না। নদী আন্দোলনে মেয়েরাই বোধহয় তাই এগিয়ে আসে বেশি। ঘরের মধ্যে আটকে পড়ে ছটফট করার কষ্ট তার যে বড়ই চেনা বড়ই বেদনার। মেয়ে পর হবে, সায় মেলে না। নর্মদা যে ঘরের মেয়ে।

নদী আন্দোলনে তাই সংগঠন চেহারাও বেশ খানিকটাই অচেনা। চাহিদার সঙ্গে মেলে না। আমাদের প্রাত্যহিক অভ্যস্ততায় সংগঠন মানে, ইউনিট - লোকাল কমিটি - অঞ্চল কমিটি - জেলা কমিটি - রাজ্য কমিটি - কেন্দ্রীয় কমিটি। নীচের কমিটি ওপরের কমিটির অধীন। ওপরের কমিটি তার ওপরের কমিটির অধীন। অধীনতা ভিত্তিক কমিটি, বশ্যতা ভিত্তিক কমিটি। কমিটির মধ্যে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুর অধীন। সবাই অধীন কেন্দ্রীয় সম্পাদকের। সম্পাদক যেন সিঁড়ির এক্কেবারে ওপরের ধাপের পোপ। ভাটিকান সিটিতে বসে সারমন দেন। সবকিছু ভাল মন্দ, কোন কথাটা কার আগে বলতে হবে, সূর্যও কোনদিন পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে কিনা ঠিক করে দেন।

নর্মদা আন্দোলনে মেধাকে দেখেছি আর সব বৌ - ঝিদের সঙ্গে জল তুলতে, উঠোন ঝাঁট দিতে, কোদাল টেনে জমা জল বের হওয়ার রাস্তা করে দিতে। কমিটি প্রথা খুবই সম্ভব লৌহকঠিন নিগড়ে বাঁধা নয়। হয়ত সেটা স্বাভাবিক। যে আন্দোলন নদীমুখ খুলে দিতেচায়, যে আন্দোলন বাঁধন মুক্তির আন্দোলন, যে আন্দোলন প্রবাহে আনন্দ পায়, আনন্দ পায় জলোচ্ছাসে, সেই আন্দোলন অহেতুক কেন আস্টেপিস্টে বাঁধতে চাইবে সংগঠন? শৃঙ্খল ছাড়া শৃঙ্খলাই এই আন্দোলনের মেজাজ। অধীনতা নয় স্বাধীনতাই এই আন্দোলনের ভারকেন্দ্র।

মার্কসীয় ধারণায় এই আন্দোলন, এই সংগঠন চেহারা, বোঝা শক্ত, চেনা শক্ত। অনুভব করা শক্ত, এই আন্দোলন চেনা যায় ভালবাসায়। যে ভাললাগা নিয়ে বর্ষার প্রথম জলে ভিজে ওঠা মাটি, হাতের নরম চাপে গুড়োঁ গুঁড়ো করে কৃষক ঘ্রাণ নেয়, আদিগন্ত শস্যক্ষেত্রের সবুজ স্নিগ্ধ ক'রে মন, শীতের নরম রোদে সরষে - ক্ষেতের হলুদ - ফুলের বাতাস - ঢেউয়ে হারিয়ে যায়, উদাস হয়ে যায় মানুষ সেই সব ভাললাগা ভালবাসার শরীর নিয়েই এই আন্দোলন। এই সব ছোট ছোট ভাললাগা - ভালবাসার শরীর নিয়েই এই আন্দোলন এতদিন ধরে পথ চলছে। ক্লান্ত হয় নি, চলাতেই তার বিশ্রাম। চলা শেষে বিশ্রাম নয়। পথের শেষে ভালবাসার প্রতীক্ষা নয়, চলতে চলতেচলা। এই আন্দোলন যে বিস্তার ভালবাসে, বিস্তৃত সৌন্দর্যে আস্থা রাখে, আস্থা রাখে মানুষে, যে মানুষ প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হয়, যে মানুষ হতাশায় হাহাকার করে, দুঃখে গুমরে ওঠে, যে মানুষ তেপান্তরের মাঠের আখে বাঁধা পক্ষীরাজের বাঁধন খুলে চলন্ত সওয়ার হয়। রোমান্টিকতাও এই আন্দোলনের অন্যতম শক্তি।

বাবা আমতে বলছিলেন, হ্যাঁ, কেন রোমান্টিক নয়, পাহাড়ের কোল দিয়ে যখন নর্মদা আসে তখন দেখেছ দুপাশের পাহাড় - শীর্ষরেখা। কেমন ভুর মতো, ধনুকের মতো বাঁকা, নর্মদা যেন তার ছিলা। সটান, টানটান উজ্জ্বল ঝকঝকে।

অনেক কাল আগে একদিন শিব, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দেবতা নটরাজ, নৃত্য করবেন বলে বাসনা করলেন। শিরে নিলেন চন্দ্রতাপ। তিনদিন তিন রাত্রির সেই নৃত্যে চন্দ্র নিজেই ক্লান্ত। নৃত্যরত নটরাজ শিরোস্থির ললাট থেকে হাতের মুদ্রায় দু বিন্দু স্বেদ ঝোড়ে ফেললেন মাটিতে। স্বেদ থেকে সৃষ্টি নর্মদা, মেহনতে সৃষ্টি নর্মদা, আনন্দ উৎসারিত নর্মদা।

নর্মদা এমন এক নদী যে নদী আবহমান কাল ধরে একই ধারায় প্রবাহিত। কোনদিন প্রবাহপথ বদলায়নি। নর্মদাতে কোনদিন

বন্যা হয়নি। এই নর্মদা ভাল না বেসে পারা যায়।

আমতে, ৮৭ বছরে এক যুবক। কোমরে আঘাত থাকার দন বসতে পারেন না, বেশি হাঁটতে পারেন না, কথা বলেন শুয়ে শুয়ে। নিতাই বসেছিল বিছানার ওপর, মানুষটির পাশে। কথা বলার সময় সারাক্ষণ নিতাইয়ের হাত ছুঁয়ে রইলেন, নিত াইকে হাতে হাত বুলিয়ে দিলেন, স্পর্শেও আরও কিছু বলছিলেন, নিতাইয়ের মুখ দেখে তেমনই মনে হচ্ছিল। এই স্পর্শই বোধহয়, নর্মদা আন্দোলনের ধমনী থেকে ধমনীবাহিত।

নিতাই - ই প্রশ্ন করেছিল, আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে। আমতে বলেছিলেন, দেখো, এ হল নদীমুক্তি আন্দোলন। নর্মদা৪কে মুক্ত করতেই হবে। এতসব বাঁধে নর্মদাতো হয়ে উঠবে ছোট বড় জলাশয়। সংস্কৃতি বাঁচবে কি করে? নদীমাতৃক এই দেশে নদীই তো প্রথম, নদীই তো শেষ কথা।

পুনর্বাসন নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে। কিন্তু পুনর্বাসন তো একমাত্র কথা নয়। পুনর্বাসনই একমাত্র দাবি নয়। নর্মদা মুক্তি। এইউন্নয়ন ধবংসাত্মক। এই উন্নয়নে আমাদের কল্যাণ হবে না। এ - পথ সঠিক নয়, সত্য নয়।

কোনটা সঠিক, আর কোনটাই - বা বেঠিক আমরা জানি না তা নয়। আমরা জানি। বিচারবুদ্ধি দিয়ে ধরতে পারি, সত্য অ ার মিথ্যা। সঠিক আর মেকি। অনুভবও করতে পারি সুন্দর। কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সেই সত্য নিয়ে চল া। গভীর ভালবাসায় গভীর মমতায় সেই সত্যকে চুম্বন করে জড়িয়ে ধরা, সত্য নিয়ে প্রতিদিনের জীবনচর্যা, সত্য নিয়ে হাঁট া, ফেরা।

নর্মদা আন্দোলনের সর্বত্র জনশক্তির ওপর বিশ্বাস। সংগঠন গড়ে ওঠে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে নিজেদের মত করে। ক াজ করে হাতে হাত লাগিয়ে। আগেরবার মেধা বলছিলেন, দেখো, মেয়েদের হাতে এখানে অনেক দায়িত্ব থাকায় ওরা অ ান্দোলনকেই দেখে পরিবারের মতো। এমনকি খেয়াল রাখে, কে কোথা থেকে এল, তাড়াতাড়ি চলে যাবে কিনা, যাওয়ার আগে ঠিক ঠিক খাইয়ে দেওয়া, সবকিছু। আন্দোলনে এদের সবটুকু মমতা। হয়ত এটা ঠিক, অনেক কিছু নিয়ে অনেক কথ া বলতে পারে না কিন্তু এই আন্দোলনের সবটুকু ওদের বড় আপন, বড় চেনা। এই আন্দোলনের রাশ অনেকটাই ওদের হ াতে। গাঁ এলাকা পাহারা দেওয়া, পুলিশ প্রশাসনের কাছে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ, সংগঠনের কাছে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে যাওয়া সবই করে পুষেরা। কিন্তু যাওয়ার আগে ওদের খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো হয়েছে কিনা, যেখানে যাচ্ছে সেখান থেকে আন্দোলনের জন্য কিছু আনতে হবে কিনা, সে হিসাবও রাখে মেয়েরা। আন্দোলনের সব কাজেই ওরা সামনের সা রিতে। ওদের কাজ অনেক নিঃস্বার্থ।

বাবা আমতে বলছিলেন দেখো, আমাদের মধ্যে নিরন্তর লড়াই লোভ আর চাহিদার। এ লড়াই নিজের মধ্যে, এ লড়াই মনুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র চায় সবকিছু নিজেদের মুঠিতে রাখতে। আমাদের চাহিদাটুকুতেও ওদের লোভ। আমাদের চা হিদা আমাদের আদায় করে নিতেই হবে। আর এই আদায় করতে গিয়ে আমাদের নিজস্ব লোভের বিদ্ধেও সজাগ থাকতে হবে।

(বাবা আমতের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয় ১ ঘন্টারও ওপর। টেপ রেকর্ডারে কথাবার্তা তোলাও হয়। কিন্তু রেকর্ড - প্লয়োরের গোলমালে সাক্ষাৎকার এখনও উদ্ধার করা যায়নি। যদি যায়, তবে তার সম্পূর্ণ পাঠ কোন এক সংখ্যায় প্রকা শিত হবে। ওপরের কথা হুবহু নয়। কথা যেভাবে স্মৃতিতে অন্যান্য অনুসঙ্গে জড়িয়ে থাকে সেভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে) ।। নয় ।।

খেড়ি-বলওয়ারি থেকে রাতে যখন বরওয়ানি ফিরলাম শহরের রাজপথে তখন নর্মদা আন্দোলন নিয়ে এক মশাল মিছিল। ছোট কিন্তু দৃপ্ত।

পরের দিন রাতে শিপ্রা একসপ্রেসে ইন্দোর থেকে হাওড়াগামী ট্রেনে ওঠার আগে শিপ্রা নদীতে স্নান করলাম। মান, নর্মদা ছুঁয়ে শিপ্রায় এসে খুব তৃপ্ত লাগছিল। শিপ্রার সঙ্গে আমাদের যোগ কতদিনের। উজ্জয়িনীও তো আমাদের বড় চেনা।

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে ...

বহু শতাব্দী আগে ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠেছিল এইসব অঞ্চলে। স্থায়ী সেনাবাহিনী রাখা হত না। প্রয়োজনে প্রতি ঘর থেকে ছেলেমেয়েরা এসে বাহিনীতে যোগ দিত। রাজার ছেলে রাজা হত না। রাজাকে নির্বাচিত হতে হত। স্বাধীন নির্বাচন। প্রজার হয়ে রাজা ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করে নিতেন না। রাজার কাজেই রাজার ওপর অনুর াগ, বিরাগ। একদল রাজানুগ্রহী দিয়ে রাজার অনুকূলে 'কনসেন্ট ম্যানুফ্যাকচার' করার প্রয়োজন হত না। স্বাধীনতার সে ম ানেও এই ভারতেরই ঐতিহ্য।

।। ঋণস্বীকার ।।

১। শ্রী নিতাই ঘোষ ও শ্রী প্রবীর মিত্র, এই পরিক্রমায় আমি যাদের সঙ্গী ছিলাম।
২। খত্তব্রব্ধপুপ্সপ্সন্স পত্রিকায় প্রকাশিত অরুন্ধতী রায়ের প্রবন্ধ 'The Cost of Living, Power Politics, এবং এই লেখকের পুস্তিকা End of Imagination.
৩। Humans cape পত্রিকায় প্রকাশিত গেইল ওমভেট, আশিস কোটারি ও রাহুলের নর্মদা আন্দোলন বিতর্ক।
৪। অমিতাভ ঘোষর Count Down।
৫। কালধবনি পত্রিকার সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ ও অক্টোবর, ১৯৯৯ সংখ্যা।
৬। www.narmada.org
৭। www.sardarsarovardam.com

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com